

## পাখিসখ্য

### কাজী জহিরুল ইসলাম

আজ সকালে পিয়াকাকে মুক্ত করে দিলাম।

পিয়াকা অগ্নির পোষা টিয়া পাখি। ওরা যখন তিনমাসের জন্য আবিদজানে বেড়াতে এসেছিল, অগ্নি বায়না ধরলো পাখি পোষার। পিয়াকাকে ও কথা শেখাবে, প্রবাসের নিঃসঙ্গতা কাটাতে ওরওতো একজন বন্ধু চাই। অগ্নি চলে গেছে, পিয়াকা এখন একা। দু’দিন আগে সাজাহান ভাইয়ের (সাজাহান সরদার) ই-মেইল পেলাম, পাখিবরণ উৎসবের জন্য লেখা চাই। রোজ সকালে মারকোরির বারান্দায় বসে পিয়াকার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কি লিখবো? পিয়াকাও আমার অসহায়, নিঃসঙ্গ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কি যেন বলে চেচামিচি করে। এই টিয়া পাখিটি আমাদের দেশের টিয়া পাখির মতো না। ওর গায়ের রঙ ধূসর কিংবা অনেকটা কালোর কাছাকাছি। জালালি কবুতরের মতো। ঠোঁটের রঙটাও কালো। ভু-গোল বদলের সাথে সাথে শুধু মানুষেরই না, পাখিদেরও গায়ের রঙ বদলে যায়, চরিত্র বদলে যায়। যখন রিভিয়েরাতে থাকতাম তখন রোজ ভোরে আমার ঘুম ভাঙতো একদল পাখির ডাকে। ছোট ছোট পাখি। ঠিক আমার মাথার কাছে যে জানালাটা ছিল, ওটা প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এলোমেলো বেড়ে ওঠা কতগুলো আরমেন্দা ফুলের ডালে। আরমেন্দার সরু, লম্বা পাতা আর হলুদ ফুলের রাজ্যে বসে একঝাক নাম না জানা পাখি ফর্সা হবার আগে থেকেই প্রকৃতির এক অপূর্ব টিউন বাজিয়ে আমার ঘুম ভাঙতো। এমন মধুর, সুরেলা আর রিদমিক পাখির ডাক আমি খুব কমই শুনেছি।



এখনো আমার ঘুম ভাঙে পিয়াকার ডাকে। পিয়াকা নানান ভঙ্গিতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সুর করে ডাকে। এক এক বেলায় ওর কণ্ঠে একেক রকমের সুর। ভোরবেলা ও আমার ঘুম ভাঙায় বেশ ককর্শ কণ্ঠে। যেন আমার স্কুলের দেবী হয়ে যাচ্ছে, ও আমার অভিভাবক, ধমকের সুরে বলছে, জলদি ওঠো। আমিও ধরফর করে উঠি। গিয়ে দেখি পানির পেয়ালাটি উল্টে ফেলে দিয়েছে অথবা বাদামগুলো খেয়ে খোসার মধ্যে পা দিয়ে খোঁচাখোঁচু করছে। বুঝতে পারি ওর ক্ষুধা লেগেছে, পিপাসা লেগেছে। আমি ওকে বাদাম

দিই, পানি দিই। এইভাবে ওর সঙ্গে আমারও একটা সখ্য গড়ে ওঠে। বিকেলবেলা যখন পিয়াকা ডাকে তখন ওর কণ্ঠে ঝরে পড়ে সুমধুর সুর। এতো সুরেলা কী করে হয় টিয়াপাখির ডাক? সুরটিকে ও টেনে ওপরে তুলে তারপর আস্তে আস্তে ছাড়ে। এই সময়ে ওর ডাকের মধ্যে একটা একাগ্রতা এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেন কোন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে গান করছে। সামনে ওর লক্ষ লক্ষ শ্রোতা, দর্শক। আবার সন্ধ্যার পরে ও ডাকে অনেকক্ষণ পর পর। হঠাৎ একটা ডাক দেয়। সেই ডাক দ্রুতগামী গাড়ির হঠাৎ ব্রেক কষা চাকার ঘর্ষণের শব্দের মতো। শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে এটা পাখির ডাক। এক যান্ত্রিক শব্দ বেরিয়ে আসে ওর কণ্ঠ থেকে। পাখিটার গায়ের রঙে কোন বৈচিত্র্য না থাকলেও ওর চরিত্রটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

অগ্নি যখন পাখিটি কিনে আনে তখন ওর মা খুব রাগ করেছিল। আমার প্রশ্নেই ও এটা করতে পেরেছে। অগ্নি হয়েছে আমার মতো। ছেলেবেলায় আমিও পাখিদের ওপর খুব ভালোবাসাময় অত্যাচার করেছি। বন্যাগাছের খোড়লে হাত ঢুকিয়ে চুরি করে এনেছি বালিহাঁসের ডিম। সেই ডিম মুরগীর ওমে একুশ দিন রেখে বের করে এনেছি বালিহাঁসের বাচ্চা। কতো যে বকের ছা বাঁশবন থেকে ধরে এনেছি তার কোন হিসেব নেই। প্রতি বছর কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পরে স্কুল ছুটি হলে গ্রামে চলে যেতাম। একটা লম্বা সময় গ্রামে কাটাতাম। তখন বাঁশঝাড় থেকে বকের ছা জোগাড় করতাম। ওকে মাছ খাওয়াতাম, শামুক খাওয়াতাম। গোপাটে নিয়ে গিয়ে উড়াল শেখাতাম। ক’দিন খাঁচায় রেখে তারপর ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ততোদিনে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যেত। ও আর কিছুতেই উড়ে যেত না। নারকেল গাছের পাতার ওপর বসে থাকতো। আমি ‘আয় আয়’ বলে ডাক দিলে ও এসে আমার মাথায় বসতো, কাঁধে বসতো। নানী বলতেন, এই বগায় তর চোখ নিবো। তুই কানা অবি। আমি কানা হইনি। আমার ছুটি শেষ হয়ে যেত। আমি ঢাকায় চলে আসতাম। নিষ্ঠুর মানুষেরা তখন আমার অসহায় বকটিকে কানা করে দিত। কোচ দিয়ে গাঁথে ফেলতো। সবাই জানতো এটা বাদলের বক। বুনো বক মানুষের এতো কাছে আসে না। তা সত্ত্বেও ওরা এটা করতো। আমার কাছে খবর আসতো। বড় মামা পিঠা নিয়ে, ডোবার কৈ মাছ নিয়ে ঢাকার আসতেন। তারপর আমাকে কাছে ডেকে বলতেন, তর বগাডা নাই। হাসন মোল্লার পুতে কোচ দিয়া ধৈরা খাইয়ালাইছে। আমি তখন বাথরুমের দরোজা বন্ধ করে কাঁদতাম। কান্নার হেচকি উঠে যেত। কিছুতেই বুঝতাম না মানুষের লোভ কি করে স্নেহ-মমতাকে ছাড়িয়ে যায়। কি করে সুন্দরকে হত্যা করে কেবল খাওয়ার জন্য। ইচ্ছে হতো তক্ষুণি ছুটে যাই খাগাতুয়া গ্রামে। গিয়ে সেই হত্যাকারীর টুটি চেপে ধরি।

পরের বছর আবার গ্রামে যেতাম। আবার আরেকটি বকের ছা জোগাড় করতাম। সেটারও একই পরিনতি হতো। বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম সারাদিন। পাখিদের পিছু নিতাম। ভোরবেলা তিলা ঘুঘু ডাকতো, ‘আতিথি ফু...র ফু...র’ বলে। শেষ বর্ষায় ‘টুব, টুব’ করে ডাহুকী ডাকতো কচুরীপানার দামের ভেতর থেকে অথবা পুকুরের পাড়ে গড়ে ওঠা শত বছরের পুরোনো কোন ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে। ‘পুত পুত পুত’ করতে করতে কতোবার দেখেছি পুত্রশোকে আইডাকুপিকে আঁড়ার ভেতরে ঢুকে যেতে। দোয়েল তখন শিষ বাজাতো সীমফুলের মাচায় বসে। শালিখকে আমাদের অঞ্চলে বলে বাতল খা। আর যেটার ঠোট বেশি হলুদ, দেখতে কিছুটা কুৎসিত, কাচা পায়খানায় বেশি দেখা যায় খুটে খুটে পোকা খেতে, ওটার নাম গুঅল খা। বাতল খা ছিল দুই রকমের। একটার নাম চটি বাতল খা। চটি বাতল খা আকারে একটু ছোট, মাথায় চমৎকার বুড়ি। এই পাখিটা পোষ মানে এবং অতি দ্রুত মানুষের মতো কথা বলা শিখে ফেলো। বালাপাড়ার দিলা সবসময় চটি বাতল খা পুষতো। কতোদিন দেখেছি মাছরাঙা ওর রঙিন ঠোট নিয়ে ঝুপ করে পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে মাছ শিকার করছে। মাঝে মাঝে আমি পুটিমাছ দিয়ে বড়শি পাততাম শোল-বোয়াল মাছ ধরার জন্য। কতোদিন যে দুট্ট মাছরাঙা আমার বড়শির পুটিমাছ চুরি

করে খেয়েছে। পুকুরের পাড়ে মাটির গর্তে খড়-কুটো জড় করে মাছরাঙারা গড়ে তুলতো ওদের নিবাস। বড়ই গাছে ছোট্ট টুনটুনি গড়ে তুলতো অদ্ভুত শৈল্পিক বাসা। সুলতান মিয়ার তালগাছ থেকে ঝড়ের দিনে একটা-দুইটা বাবুইয়ের বাসা খসে পড়তো। আমরা প্রতিযোগীতা করে ঝড়ের দিনে তালগাছের তলায় গিয়ে হাজির হতাম বাবুইয়ের বাসা সংগ্রহের জন্য। যে একটা বাবুইয়ের বাসা পেত আমরা তাকে বলতাম সৌভাগ্যবান। এতো শৈল্পিক বাসা এতটুন পাখি কি করে বানায় আমরা এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতাম। গরুর চোচে অথবা বোয়ালিয়া বড়শির ছিপের মাথায় বসে কুচকুচে কালো ফিঙে সারাক্ষণ কি ভাবতো কখনোই বুঝতে পারতাম না। আমরা ফিঙেকে বলতাম পাখির রাজা। ও মাঝে মাঝে শিকারী চিলকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিত। একটা কাঠঠোকরা ‘পরিস্কার’ খালার বুড়ো আমগাছের শরীরে ঠকঠক করে ঠুকরে ঠুকরে খোঁড়ল বানাতো। আর আমার নানীর ধানের খোলায় ঝাকে ঝাকে চড়ুই পড়তো দুপুরের রোদে। নানী বলতেন, বাদল চড়ুইগুলি লড়া। আমি ওদেরকে তাড়াতাম না, যতক্ষণ না নানী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। তিনি রেগে গিয়ে বলতেন, ধুরো গোলাম, পৈখে ধান খাইয়া শেষ করলে আমরা খামু কি? হেমন্তকালে দেখতাম খুব ভোরে বাঁশবনের একেবারে চূড়ায় বসে লাউয়া ঘুঘু দম্পতি মনের সুখে ‘ঘু ঘুউউউ ঘু’ সুরে একেবারে নির্ভুল ছন্দে ডাকতো। কবিতায় আমি যে ছন্দ ব্যবহার করি। এই ছন্দ আমি পাখিদের কাছ থেকেই শিখেছি। পাখির চেয়ে বড় ছন্দের শিক্ষক আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

ঘুঘুর ডাকের মধ্যে আমি সবসময় একটা বিরহের সুর শুনি। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে যখন সাত সমুদ্রের তের নদী পেরিয়ে মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ে গিয়ে হাজির হই। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ঝাউগাছের ছায়াগুলো ক্রমশ লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ফসলের মাঠে। তখনো ঘুঘুর ডাক শুনেছি, অবিকল সুরে। আবিদজানেও মাঝে মাঝে ঘুঘু ডাকে। সেই একই সুর, একই ছন্দ। আর একই বিরহের আর্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কাক আছে। তবে সব দেশের কাকের রঙ এবং চরিত্র এক রকম না। কসোভোর আকাশে যে কাক উড়ে বেড়ায় ওরা আকারে অনেক ছোট এবং গায়ের রঙ শুভ্র-ধূসর। ওরা কখনো একা একা ওড়ে না। ওড়ে দল বেধে। যেমন আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখিরা শীতকালে দলবেঁধে উড়ে আসে ঠিক সেই রকম। কসোভোর আকাশে বিকেলের সোনারোদে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় হাজারো কাকের ঝাঁক। কখনো মালার মতো, কখনো মেঘের মতো, আবার কখনো রঙধনুর মতো অর্ধবৃত্ত তৈরী করে উড়ে বেড়ায় ওরা। সাধারণত বিকেলের দিকেই ওদেরকে এরকম দলবেঁধে উড়তে দেখা যায়। কসোভোর কাকদের শরীরও খুব মসৃণ এবং কাকগুলি মোটেও নোঙরায় নামে না। ওরা কা কা শব্দেও ডাকে না। ওরা ডাকে চিহি চিহি ধরনের শব্দ করে। আইভরিকোস্টের কাকগুলি আকারে বড়। দাঁড়কাকের সমান। তবে গায়ের রঙ কালো নয়। এখানকার কাকগুলি অবিকল পেঙ্গুইনের মতো। বুক এবং গলা শাদা। ডানা এবং পিঠ কালো। কোট পরা ভদ্রলোকের মতো, ওরাও দলবেঁধে চলাফেরা করে। আইভরিকোস্টের কাকদেরও আমি কখনোই ময়লার বিনে নামতে দেখিনি। বরং এখানকার ধবল বকগুলি সারাদিন শহরের ময়লার বিনগুলিতে পড়ে থাকে। আমার কাছে মনে হয় কালো মানুষের দেশ আইভরিকোস্টের প্রকৃতি শাদাদের তৈরী বর্ণবৈষম্যের শোধ নিচ্ছে এখানে। শাদা বকদের দিয়ে সাফ করাচ্ছে শহরের নোংরা আবর্জনা।

শুধু পিয়াকার ডাক নয়, বারান্দার গোলাপের ডালে, গন্ধরাজের ডালে বসে আরো অনেক পাখি ডাকে। ওপাশের বাড়িতে একটি কাজু বাদাম গাছ। ওটার ডাল থেকে রোজ বিকেলে ভেসে আসে ঘুঘুর ডাক। পান্থনিবাসের বিশাল পাতার ওপরও বসে বসে নাম না জানা কতো পাখি ডাকে। অগ্নির সে সুযোগ কোথায়? আটপৌরে ঢাকা শহরের চারদেয়ালে বন্দী ওদের জীবন। প্রকৃতির মধ্যে ওড়ে বেড়ানো মুক্ত স্বাধীন পাখির ডানায় যে স্বতস্ফূর্ততার আনন্দ তা ওরা দেখতে পায় না। তাই ওরা বন্দী পাখির খাঁচার

দিকে তাকিয়ে থেকে কল্পনা করে বিস্তৃত ডানার উড়াল। এই প্রজন্মের শিশুরাও তাই নিজেদেরকে ক্রমশ বন্দী করে ফেলছে কম্পিউটারের বাক্সে। অগ্নি হয়ত শুনে কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু আমি কিছুতেই পিয়াকাকে খাঁচার ভেতরে আটকে রেখে পাখির ওপর কিছু একটা লিখতে পারছি না।

বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি খাঁচার চারপাশে ঘুরঘুর করছে পিয়াকা, সাথে ওর এক নতুন সাথী। নতুন সাথীটি বেশ হস্ট-পুস্ট তবে ভিতু। আমাকে দেখেই উড়ে পালালো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১০ নভেম্বর, ২০০৬